দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

# কেউ নিরক্ষর থাকবে না

"আমি নিরক্ষর থাকবো না।" মূলতঃ এই দৃঢ় মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের বিভিন্ন কার্যক্রমে। প্রতি বছর আটই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়ে আসছে। '৬৫ সাল থেকেই এর শুরু। আমাদের দেশেও এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নানাবিধ কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এ উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন। এই দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সকলকে সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

আমরা জানি যে শিক্ষাই হচ্ছে আলো। নিরক্ষর মানুষকে অনেকটা অন্ধজনের সাথে তুলনা করা চলে। সে জগৎ সংসারের কোন বিষয়ের উপরই পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে অক্ষম। কিন্তু একজন শিক্ষিত মানুষ তার জীবন সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাবলী সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারে। সে কারণেই বলা যায় যে শিক্ষা ব্যতীত মানবিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই আধুনিক যুগে শিক্ষা ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। কৃষি ক্ষেত্রেই বলুন কিংবা শিল্প ক্ষেত্রেই বলুন, অর্থনৈতিক তৎপরতার যে কোন কাজেই শিক্ষা অপরিহার্য ব্যাপার। উন্নয়নের চাবিকাঠিই হচ্ছে এখন শিক্ষা। শিক্ষার প্রাথমিক দিক হচ্ছে মানুষকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা। তাকেই আমরা সাক্ষর বলে অভিহিত করে থাকি। ইউনেস্কো এ ক্ষেত্রে অবশ্য একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। তা হলো দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে যিনি একটি সহজ বিবরণী পড়তে ও লিখতে পারবেন তাকেই বলা হবে সাক্ষর। তদনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার যে হার বিদ্যমান তা কোনভাবেই আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করে না।

আজকের পৃথিবীতে "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচীর প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের দেশেও অবশ্য তার কোন ব্যতিক্রম নেই। আমাদের দেশে শিক্ষিতের শতকরা হার হচ্ছে '৯৩ সালের হিসেব অনুযায়ী ৩২·৪। তবে বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা এখন ক্রমশই বাড়ছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে প্রথমে দেশের ৬৮টি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এতে দেখা যায় যে, যে সব থানায় উল্লিখিত কর্মসূচী চালু হয়েছে সেখানে বিদ্যালয়ে শিশুভর্তিহার শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উৎসাহজনক সাড়া পাবার পর '৯৩ সালের জানুয়ারী মাস হতে সারাদেশেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে একটি করে প্রাইমারী স্কুল বা মাদ্রাসা কিংবা কিন্ডার গার্টেন রয়েছে। ছয় থেকে দশ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ হয়েছে। তবে ভর্তির সংখ্যা বাড়লেও 'ড্রপ আউট' বা ঝরে পড়ার কারণে এদের মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাইমারী শিক্ষা কোর্স সফলতার সাথে শেষ করতে পারে। তাই শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার উন্নত করা, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা এবং 'ড্রপ আউট' প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর অধীনে প্রায় সাত লক্ষ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছে। দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন এলাকা বাদে ৪৬০টি থানায় একটি করে মোট ৪৬০টি ইউনিয়নের সকল সরকারী ও রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি করে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই কর্মসূচীর সুফল দেখে আগামীতে তা আরও সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে আমরা সবাই আজ বদ্ধপরিকর। সরকার শিক্ষা খাতকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা এবং গণশিক্ষা কর্মসূচীর কাজ হাতে নিয়েছেন। একটা ব্যাপার এখানে খুবই লক্ষণীয় যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অতীতে নানাধরনের ব্যাপক কর্মসূচী ও অভিযান নেয়া হলেও, তুলনামূলকভাবে তেমন সাফল্য দেখা যায়নি। এ কথা কেবল বাংলাদেশের বেলায় নয়, তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশের ক্ষেত্রেই এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিরক্ষরতা যেমন আমাদের অগ্রগতির অন্তরায়, তেমনি দারিদ্র্যও হচ্ছে অপর একটি প্রধান বাধা। তাই এই দুই বাধাকে একসাথে হঠাবার জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সুফল বেশী আশা করা যায়। এ ব্যাপারে শ্রীলংকার কথা অবশ্যই উল্লেখ করা চলে। তারা এভাবে কর্মসূচী নিয়ে শিক্ষিতের হার ৮৫ ভাগে উন্নীত করতে পেরেছেন। আমাদের দেশে '৬১ সাল থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত লোকের হার বেড়েছে শতকরা মাত্র ৭·৮ ভাগ।

শিক্ষাই সকল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রত্যয়ী ও সৃজনশীল সমাজ গঠনে সহায়তা করে। তাই প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার এবং নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তি ও উপবৃত্তির প্রবর্তন করা হয়েছে। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক নরনারী যারা শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত তাদের জন্য সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

পৃথিবীতে বর্তমানে যত নিরক্ষর লোক রয়েছে তার তিন চতুর্থাংশের ভাগ হচ্ছে অনুন্নত বিশ্বে। এর জন্যে বাংলাদেশও রয়েছে। আমরা সাক্ষরতা কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে গেলেও জন্মহারের তুলনায় সাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে বাড়ছে না।

দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি এসব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সাক্ষরতার হার বাড়ানো আজ একান্তই অপরিহার্য। যত বেশী সংখ্যক মানুষকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা যায় ততই মঙ্গল। বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসে সকলের সচেতন ভূমিকা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ তাই আজ বিশেষ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সাক্ষর সমাজ গঠনের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি আজ বেসরকারী অনেক সংস্থা এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। তাই সাক্ষরতার মাধ্যমে উন্নয়নের পক্ষকে সুগম করে তোলাই হউক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

—পিআইডি ফিচার